কেন সংবাদপত্র পড়িনা, কেন সংবাদপত্র পোড়ালাম, কেন সংবাদপত্র কিনি

সুব্রত ঘোষ

একটি সাংঘাতিক বাণী “I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.” – (ভলতেয়ারের নিজের কথা না হলেও) ভলতেয়ারের নামেই পড়েছিলাম একাদশ শ্রেণীতে, কথাটি মনে বড় করে গেঁথে যায়। পড়ে শুনি সুমনের গানে, ‘বিরোধীকে বলতে দাও’। আমি একমত নই, আপনি ভিন্ন মতের — তর্ক চলুক, বিতর্ক চলুক – কিন্তু থামানো যাবেনা কোন পক্ষের বলাকেই। জোর করাও যাবেনা কোন একটা মতের পক্ষে আসতে। কলেজে পড়ার সময় ছাত্রকে ‘অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার’ প্রবন্ধ লেখাতে গিয়ে বুঝতে পারলাম, যে সংবাদ পত্র ‘মধ্যযুগীয় বর্বরতা : কুকুরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিল বাবা’ শিরোনামে ফ্রন্ট পেজ খবর করে সেই কাগজই ভিতরের পাতায় ‘আপনার আজকের দিনটি কেমন যাবে’ খবর ছাপে। ব্যাস সেই সময় থেকেই সংঘাত শুরু। আরও বড় হলে বুঝলাম গোটা পৃথিবীর চরিত্রটা এই সময়ে এমন বদলে গেছে যে যুদ্ধটা আর ময়দানে হচ্ছে না, হচ্ছে ড্রয়িংরুমে, সিরিয়ালে, ফেসবুকে, অনলাইন শপিং থেকে ইমেইল ইন্টারনেটে। বাজার ধরতে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ব্রিলিয়ান্ত ছেলে মেয়েদের। আমিও তার অংশীদার। “I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.” এত সহজ নয়। কেউ বলতে আসবে না, আসছে না অন্য মতের হয়ে। কারণ ওদের মত তৈরি হয়ে আছে। ওদের তৈরি মতের বিরুদ্ধে কথা বললে তুমি প্রতিক্রিয়াশীল, উন্নয়ন বিরোধী, দেশদ্রোহী। সিনেমা বানাতে চাইলেও ওদের মত বানাতে হবে, লিখতে চাইলেও ওদের মত। কয়েকজন বন্ধু বান্ধবী ‘উনিশ কুড়ি’ পত্রিকায় কাজে ঢুকল। ফিরে এসে জানাল ওদের ভাষাটা রপ্ত করতে শেখাচ্ছে এখন। শিখে গেলে লিখতে পারবে নিয়মিত। বেড়াতে গিয়ে খাওয়ার টেবিলে ‘চব্বিশ ঘণ্টা’ থেকে ‘এবিপি আনন্দ’র সাংবাদিক বন্ধুরা হতাশায় ভেঙে পড়েছে, কিন্তু চাকরী ছাড়তে পারেনি অন্য উপায় না পেয়ে। খবর তৈরি হয়, খবর তৈরি করা সম্ভব। এ দুনিয়ায় ভাই সবই হয়, সব সত্যি। ইয়োলো জারনালিসম কি জিনিস চার মাস টিভিতে কাজ করেই বুঝে গিয়েছি তখন। — ব্যাক্তি মানুষকে প্রতিদিনের খবরে কি ভাবে নস্যাৎ করে দেওয়া হয় খবর পরিবেশনের নামে, মানুষ খবর জানতে চাইছে এই অজুহাতে, মানুষকে সত্য জানানো হচ্ছে এই অছিলায়। –তবু কলকাতা ছাড়তে মন চাইত না। নাটক সিনেমা লেখা ছেড়ে থাকব কি করে? অবশেষে স্কুলের চাকরিটা দুম করে পেয়ে যাওয়ায় সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললাম। চলে এলাম বোলপুর। এইখানেই আছি গত সাত বছর।

গ্রামের বাড়িতে ‘আনন্দবাজার‘ নেওয়া বন্ধ হয়েছে তিনবছর হল, ‘দেশ’ পত্রিকা নেওয়া বন্ধ হয়েছে প্রায় দশ বছর। আমি নিয়মিত কাগজ পড়া ছেড়ে দিয়েছি ৫ বছরেরও অধিক কাল। সপ্তাহান্তে বাড়ি গিয়ে আধঘণ্টা বসি (এখন ‘এই সময়’ নেওয়া হয়) সব কাগজগুলো নিয়ে, যে বিষয়টি পড়ার মত মনে হয় পড়ে নিই। সক্কাল সক্কাল দুনিয়ার বা দেশের সমস্যা পড়ে ভারাক্রান্ত মনে যখন কাজ করতেই পারছিলাম না তখন ‘পজিটিভ থিঙ্কিং’ বিষয়ে একটা বই হাতে পাই। আর দেখি সকালের খবর কাগজ বা টিভির খবর কি পরিমাণে আমার শক্তি ক্ষয় করে দিচ্ছে। প্রথমে নিজেকে মুক্ত করে পরে অনেক বন্ধু বান্ধবীকে ছাত্র ছাত্রীকে এই ‘খবর কাগজ পড়ার হ্যাবিট’-এর বিষাক্ত ছোবল থেকে বাঁচিয়েছি। খুব কঠিন, কিন্তু অনেকেই আজ ভালো আছে, নিজের কাজ করতে পারছে মন দিয়ে। আজকাল তো সোশ্যাল সাইটের দৌলতে গুরুত্বপূর্ণ খবর এসে যায় হাতের নাগালে। অতএব দিব্বি আছি। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল আজ কেন খবর কাগজ পোড়ালাম? আমি তো খবর কাগজ পড়িই না।

আমি বলতে যাইনি কাল থেকে সংবাদ পত্র ছাপবেন না, আপনাদের মত লিখবেন না, আপনাদের মত খবর তৈরি করবেন না। আমি শুধু কাগজ পুড়িয়ে একটা অহিংস স্টেটমেন্ট দিলাম। ‘তমোঘ্ন’ বিষয়ে যে ন্যাক্কার জনক ভূমিকা পালন করেছে তথাকথিত এগিয়ে থাকা সংবাদ পত্রের দল তার প্রতিবাদ করছি আমি। পোড়ালাম ‘ব্যাগে প্রেমিকা ও তাঁর সন্তানের টুকরো দেহ, জালে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার‘ এটা হেডলাইন করে ‘আততায়ীর গুলিতে নিহত কর্ণাটকের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এম এম কালবুর্গি’কে প্রায় খবর না করার কারণে। একের পর এক ব্লগার খুন হচ্ছে, চাষিরা মারা যাচ্ছে, ব্যাপম কাণ্ডে শেষ হয়ে যাচ্ছে দেশ আর খবরের কাগজগুলো শ্লীল অশ্লীল শেখাচ্ছেন, শেখাতে চাইছেন বন্ ধ কিভাবে ক্ষতি করে, কেন ভর্তুকি তুলে দেওয়া জরুরী, কেন বেসরকারি মালিকানার হাতে গোটা দেশটাকে বেচে দেওয়া জরুরী। নিজের গাঁটের টাকায় কিনে সেই খবর পড়ছে সবাই। মত তৈরি হচ্ছে আসলে শাসকের পক্ষে, শোষণের পক্ষে। অতএব আমি নেই, আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমি এই অহিংস যুদ্ধে অনেককাল আগেই নেমেছি। আজ তাই খুঁজে পেতে পুরনো কাগজ পোড়াতে হল। সবটা পুড়ে ছাই হতেও দিইনি। কারণ কাগজের উপরের অংশগুলো কেটে পুড়িয়েছি। কারণ বাকি অংশগুলো কাজে লাগিয়ে রোজ সকালে আমায় বেড়ালের গু ফেলতে হয়। বলা ভালো ওদের জন্যই মাঝে মাঝে আমায় খবরের কাগজ কিনতে হয়।